আত্মপ্রকাশ
জানুয়ারি, ১৯৫৭

প্রকাশ
ঊর্মিলা দাশগুপ্ত
রক্তমাংস
৩১৯/২ নেতাজি সুভাষ রোড
হাওড়া ৭১১ ১০১

মুদ্রণ
স্বর্ণাক্ষর
হাওড়া ৭১১ ১০১

প্রচ্ছদ-অলঙ্করণ
সুব্রত চৌধুরী

লিখি, তোমাকেই লিখি..

অন্য বই

সিনেমার সুখদুঃখ (প্রবন্ধ)
পাপকথা (কবিতা)
মেঠো ইঁদুরের চোখ (প্রবন্ধ)

অপেক্ষার দিনরাত

রচনা

হে পাপিয়সী, আজ তোমাকেই লিখি
এই অদম্য জলের বুকে পিপাসার্ত নাবিকের মতো
তোমাকেই লিখি আজ জল ও রোদের গাঢ় মহিমায়
তোমাকেই লিখি কোমরের ঘুমন্ত তিলে
অবনত বুকের করুণতর নিদ্রায়
তোমাকেই লিখি আজ গুল্মের পাপে
তোমাকেই লিখি আজ রবারগাছের ছায়ায়....

জাহাজের খোলে জল ঢুকে গেলে
ঈগলের মতো সেইসব রুক্ষ নাবিকেরা
তোমার অপলক যোনির উপর
এঁকে দিয়েছিল যে-গভীরতর উল্কি
হে পাপিয়সী, আজ সেই প্লাবনের কথা লিখি
লিখি সেই জলমগ্ন কবরখানা ও
বিষণ্ণ চিনারগাছের কথা, লিখি, সব লিখি....

লিখি, সেই গভীরতা লিখি :
আর সাদা পৃষ্ঠার উপর ঝরে পড়ে
ম্লান বরফের বৃষ্টি, লিখি, সব লিখি :
তোমার খোলাপিঠ ও লঘু নিতম্বে ছড়ানো
নিদ্রার মতো সেইসব দিনলিপি, হে পাপিয়সী....

আর, লিখতে-লিখতে ভোর জেগে ওঠে ক্রমে
ভোরের প্রথম ট্রেন স্বপ্ন থেকে
অন্যতর শূন্যতার দিকে উড়ে যেতে-যেতে দ্যাখে
সেইসব সামুদ্রিক অক্ষরগুলি একটু-একটু করে
জড়িয়ে যাচ্ছে নীল, ঘননীল কুয়াশায়
আর, তার পাশে টেবিলের উপর পড়ে আছে
ভাঙা ডানা, সাদা ...

আর, লেখো, বিষপানের আগে, ওগো মহীয়সী,
তুমি লিখে যাও আমাদের শেষ এপিটাফ....

দোলমঞ্চ

মঞ্জুশ্রী চাকীসরকারের কমলারঙের শাড়ি আগুন-ফাগুন হয়ে দাউদাউ জ্বলছিল কলাভবনের মাঠে। আর সেই আগুনের পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে-বসে আমরা সকলে আগুনের সেই আবির ও বিভা মেখে নিচ্ছিলাম গায়ে ও মাথায়। তাঁর খোলা কোমরে অবিকল সরস্বতীর বিভঙ্গ, নীবিবন্ধের মতো সবুজ আঁচল জড়িয়ে নিলেন কোমরে, বালিকাবৎ ; জড়াবার আগে তাতে আলতো করে মুছলেন ঘাম। মার্চের রোদ ধুয়ে দিচ্ছিল আমাদের।

নীলাঞ্জনা হাতে জড়িয়ে ছিল পলাশের মালা, বিস্রস্ত খোঁপায় ভেঙে পড়েছিল একটি আস্ত ঝর্ণার কলকাকলি। পরম অপত্যে তাকে হাতে ধরে টেনে নিলেন মঞ্জুশ্রী। আর, তারপর, প্রবল জলতৃষ্ণার মতো, অবিরল গান আর ঝর্ণা নিবিড় বয়ে গেল সেই আতপ্ত টাঁড়ভূমির উপর, হাওয়ায় উল্টে গেল গীতবিতানের পাতা। শুকনো পাতার উপর কেবল নূপুর-হীনাদের পদধ্বনি, আর-সব স্তব্ধ, খোয়াইয়ের মতো। ভুবনডাঙ্গার দিক থেকে পুনরায় উড়ে এল সেই পাগলপারা হাওয়া।

আর, তখন, ঠিক তখনই, সেই আগুন, জল আর হাওয়ার দোলায় আমরা দু-জন ভেসে গেলাম দু-দিকে, দু-মুখী নৌকোর মতো, অবিরল।

শোকপ্রস্তাব

শোকপ্রস্তাবের ঠিক আগে হঠাৎই মুছে গেল সব রোদ। অনন্ত থেকে ঘুরতে-ঘুরতে শিল্পের বাগানে আছড়ে পড়ল সেই আকাশ, ঘূর্ণি, বজ্র ও বিদ্যুৎ এবং অবশেষে এপ্রিলের নিরর্থক বৃষ্টি, বৃষ্টি আর কেবলই বৃষ্টি।

আর বৃষ্টির সঙ্গেই এল ভেজা-চুল, ভেজা-বুক, ভেজা-শ্রোণীদেশ—যেন হেমেন্দ্রনাথের ছবি থেকে উঠে এল মৃত কবির শেষ মনীষা, শিল্পের সিঁড়িতে।

আমরা সকলেই অপলক দেখলাম, তার সবুজ মলাটের আড়ালে উঁকি মারছে দুটি অতল সাদাপৃষ্ঠা, সেখানে লেগে আছে মৃত কবির একটি-দুটি অস্ফুট অক্ষর, বরফের বিছানা, চিতার লেলিহান কিংবা খোয়াইয়ের চিহ্নাবশেষ—পৃথিবীর শেষ সনেটের মতো। আমরা সকলেই দেখলাম, সেই বিধুর উপত্যকার উপর তখনও আছড়ে পড়ছে একটি-দুটি অপলক জলবিন্দু, আর ক্রমশই আরও ভিজে যাচ্ছে সেই শিথিল টিলাদ্বয়।

আমরা দেখলাম, বৃষ্টি, আগুন ও শেষতম বিদ্যুতে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। কেননা, আমরা সকলেই দেখলাম, একটি অপূর্ণ পাণ্ডুলিপির মতো সেই ভেজা-চুল, ভেজা-বুক, ভেজা-কোমর আর ভেজা-জলস্তম্ভের পারম্পর্য তাকে নিয়ে এল সিঁড়ির চূড়ান্তে।

আর, সেভাবেই, অবশেষে, সিঁড়ি ভেঙে সে পেঁৗছে গেল শোকসভার মর্মস্থলে, একাকী বসে পড়ল একটি জ্বলন্ত ধূপকাঠির পাশে, চিত্রার্পিত, শেষবার, নিঃশরীর, আমরা সকলেই দেখলাম!

জীবাশ্ম

এপ্রিলের নিঃশব্দ রোদ্দুরে সুনসান দুপুরবেলা
রিকশা থেকে নামল যে-গোলাপি বিভা
আলতো খুলে নিল নীল সানগ্লাস,
রবারগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঠোঁট কুঁচকে
হাসল নীরবে, রোদ্দুর থেকে ঝরে পড়ল
গোলাপি বিভা ও বিভ্রম,
কোমরের খাঁজ থেকে খুলে নিয়ে টুকরো রুমাল
বোলাল চিবুকে—আমি তার কেউ নই,
তবু অন্ধ বাঘের মতো আমি সেই
গোলাপি ঘামের গন্ধ অবিকল টের পেলাম।

মরুভূমি ও শুকনো পাতার উপর জলছাপ
ফেলে হেঁটে গেল সে পশ্চিমে, বাংলোর সীমান্তে;
সারা পথে ছড়িয়ে রইল সেই অনন্ত গোলাপি
ও জলকষ্টের মতো আকুল রোদ,
রোদ আর নির্জন রবারগাছের ছায়া।

আর, অন্ধ বাঘের মতো আমি সারাদুপুর,
সারাসন্ধ্যা, সারারাত্রি পাহারা দিলাম
রবারগাছের ছায়ায় সেইদুটি নিশ্চুপ পদচ্ছাপ!

ভঙ্গুর

ঘোরনীল বনান্তরালে উঁকি দ্যায়
যে-সাদামেঘের টুকরো,
আমি আজ দূর থেকে
তার ভেঙে-পড়া দেখি...
আর তখনই শালবন কাঁপিয়ে
বৃষ্টি আসে পুনরায় ;
বৃষ্টিতে একটু-একটু করে ধুয়ে যায়
সেই গোপন জ্যোৎস্না,
যা আজ সারা-দুপুর ধরে
তুমি বাংলোর বাগানে ছড়িয়েছিলে !

তোমার হাসি ও মনখারাপের
সেইসব নিহিত বর্ণগুলি
সাদা ও অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে গেলে
বনভূমি জুড়ে বেজে ওঠে
নির্জনতার বুকচাপা কান্না ;
আর তখন, ঠিক তখনই
তোমার ধূসর ঠোঁট থেকে
শেষ জলবিন্দুটি শুষে নিতে গেলে
মুহূর্তে খান-খান হয়ে যায়
সেই স্ফটিক-নির্মাণ !

বাঘ ও হরিণীর ইতিহাস

আগে দেখিনি সেভাবে।

এ-বছর গ্রীষ্মের এক অতর্কিত বিকেলে প্রকাশিত হল ঝর্ণার মতো সাদা মালা, বটফলের মতো জ্বলন্ত টিপ, আর সারা মুখে স্ফটিকের মতো বিন্দু-বিন্দু ঘাম। দেখে রক্ত হিম হয়ে গেল !

বস্তুত, মালা, টিপ ও ঘাম ছাড়া আর-কিছু ছিল না সেই অকরুণ মুখে। কিন্তু ঝর্ণা, বটফল বা স্ফটিকও মিথ্যে নয় কিছু, বোঝা গেছে পরে।

অর্থাৎ, সহজাত সত্যি ও মিথ্যের ছলনায় ভরে উঠল সে, এই গ্রীষ্মের রনরনে রোদে। আর তাতেই কেমন পাল্টে গেল সমূহ দৃষ্টিভঙ্গি, খসে পড়ল ছদ্মবেশ, যখন সে তাকাল জল থেকে মুখ তুলে !

আর, বজ্রপাতের শব্দে নিমেষে অবনত হল এদিকের চোখ। চোখের মধ্যে ঢুকে গেল অগ্নিশলাকা। অন্ধ হল সে।

আগে দেখিনি সেভাবে।

এই বর্ষায় তার পায়ের পাতার উপর দিয়ে যখন বয়ে যাচ্ছিল অপলক জল, জল ভেঙে পড়ছিল সারা গায়ে, খেলাচ্ছলে ; উদ্ভাসিত হয়েছিল সাদা গোড়ালির উপর কৃষ্ণবর্ণ ঘোর শায়ার প্রান্ত ; সিক্ত কোমর, কড়ির মতো নাভি, যাবতীয় খিলান ও গম্বুজ ; অন্ধ অনুসরণকারীর সামনে তখনই শুরু হয়েছিল প্রকৃত পাড়-ভাঙা—তদন্তে জানা গেছে সবটাই।

আগে দেখিনি সেভাবে।

এই শরতে তার সোনালি চুলের উপর ছড়িয়ে পড়ল তুলো-তুলো মেঘ। এবারও জলের ছায়াচ্ছন্নতা থেকে মুখ তুলে চাইল সে দীপ্ত হরিণীর মতো। তখন তার সারা শরীরে যেন অরণ্যানী, সবুজ। অবনত হল সেই অন্ধ চোখ, এবারও, চিরকালের মতো।

আগে দেখিনি সেভাবে।

এই হেমন্তে যখন তার নীল আঁচলের উপর ঝরে পড়েছিল একটি বিধুর পাতা, জিভ দিয়ে অল্প ভিজিয়ে নিয়েছিল শুষ্ক ঠোঁট, দিগন্ত থেকে উড়ে এসে চশমার উপর বসে পড়েছিল একটি বিদ্যুৎবর্ণ পাখি, তখনই শুরু হল গূঢ় অগ্ন্যুৎপাত, শহরের শেষ-প্রান্তে, নৈঋর্তে, গোয়েন্দারা জানে।

আগে দেখিনি সেভাবে।

এই গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরৎ ও হেমন্তে অন্ধ বাঘের দিকে নীরব পাতার মতো মুখ তুলে তাকিয়েছে সেই হরিণী, বারবার। রক্ত হিম হয়ে গেছে শুধু!

আগে দেখিনি সেভাবে।

এই শীতে ত্রস্ত হরিণীর পায়ের কাছে, হ্রদের কিনারায়, পড়ে থাকবে সেই অন্ধ বাঘের বেভুল মৃতদেহ, দ্রষ্টারা জানে। হরিণীর জন্য বাঘের আত্মবলিদান নিয়ে লেখা হবে সভ্যতার ইতিহাস, নতুন করে, আজ থেকে আড়াই-হাজার বছর পর, কোনও গোপন গুহাগাত্রে!

পাতালের দিন

শেষরাতে পাতালের দিকে নামতে-নামতে চোখে পড়েছিল মৃত জন্তুর হাড়গোড়, ছড়ানো বল্কল, পালক ও নখদন্ত। পাতালের একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। মাঝখান দিয়ে জলপ্রবাহের মতো অনন্ত সিঁড়ি নেমে গেছে ঘোর পাতালের দিকে, চক্রাকারে।

চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাল সেই পাতালিনী। স্মিত আগুনে প্রকাশিত হল তার গাঢ় বৃন্ত, কালো শাড়ি, লেলিহান চুল। তার অন্ধকার নিতম্বে ভেঙে পড়ল আগুনের রেখা ও বিভঙ্গ। সে আমায় ডেকে নিল নিয়তির দিকে।

চতুর্দিকের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল ক্রমে। পালক, হাড়গোড়, বল্কল সাবধানে পার হয়ে যাত্রা শুরু হল তারপর। মাঝ-সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সামান্য-কিছু কথা হয়েছিল সেই গুহামানবীর সঙ্গে। পাতালে আকাশ কেমন, মেঘ জমে কি না—এরকম অলোকসামান্য কুশলাদির সঙ্গে আরও-কিছু নির্বাচিত বাক্-বিনিময়। তারপর এক ধারাবাহিক অবতরণ—নামা, নামা আর নেমে-যাওয়া।

মাঝ-পথে আগুন নিভে গেল আচম্বিত, হাত থেকে খসে পড়ল চকমকি। নিচু হয়ে কুড়োতে গিয়ে হাতে উঠে এল একটুকরো স্তন, একটি ঠোঁটের জীবাশ্ম—এইসব টুকিটাকি। আমি আঁকড়ে ধরলাম গুহাবাসিনীর কোমর, নগ্ন।

পাতালে দিন ও রাত্রির কোনও সীমারেখা নেই, বোঝা গেল ক্রমে। কোনও গোপন উৎস থেকে ছুটে আসছে অবিরল জলের শব্দ। সঞ্চিত আগুন ভিজে গেছে আগেই। সারা গায়ে তখন অন্ধকারের পোশাক, একে অন্যকে কেড়ে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। অন্ধকারে জড়িয়ে গেছে পারস্পরিক থুতু ও লালা, ঈড়া ও পিঙ্গলা। পাতালের পঁচিশটি ঘড়িতে পঁচিশরকম সময়, শূন্য বিছানায় অন্ধকারের গুঁড়ো, অন্ধকার শাড়ি ভিজে উঠছে আরও অন্ধকারে, গূঢ়।

অন্ধকারের বুক খুলতেই খসে পড়ল কালো শাড়ি, অন্ধকারের স্তনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া শঙ্খলাগা বাদুড়। উড়তে-উড়তে ঢুকে পড়ল চোখের কোটরে।

ইতিমধ্যে কেটে গেল সামান্য আড়াই-হাজার বছর। ততদিনে অন্ধকার সয়ে এসেছে চোখে। গুহামুখে জমেছে পাথুরে মেঘ। বিছানায় পড়ে

আছে ছড়ানো পশম ও হাড়গোড়, কালো শাড়ির অবশিষ্ট জরি ও কাঁচুলির অসামান্য ফাঁস। তাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা হয়। পাতালের বাইরে রোদ বা বৃষ্টি কতটা নিরাবেগ, সবুজ বা নীল কতটা সমানুপাতিক— এসব আলোচনা কালোশাড়ি খুব-যে পছন্দ করে, তা নয়। তবে বৃক্ষের প্রতি তার তত আগ্রহ নেই, জল বা আগুনও তার বেশ অপছন্দের, এটা প্রামাণ্যই বোঝা গেছে।

তবু কথা হয়ই কিছু, নীরবতার মতো অকিঞ্চিৎকর কথা ও বার্তা, ধারা-বাহিক। কথা হয় থুতু ও লালায়, ঈড়া ও পিঙ্গলায়। আর, পাতালের উপর আছড়ে পড়তে থাকে আরও পাতালের শব্দ, স্বপ্ন, দিন যায়।

জলদেবতা

সুদূর মাঠ ভেঙে যখন হাহাকারের মতো একটি বাতাস আছড়ে পড়েছিল তোমার দরজায়, দুলে উঠেছিল তোমার গাঢ় পর্দা ও বইয়ের পৃষ্ঠা ; তখনও সেই সংকেত টের পাওনি তুমি ! আর, সে-সুযোগেই ওই সবুজ পর্দা সরিয়ে আততায়ীর মতো ঘরে ঢুকেছিল সেই নিঃশব্দ বাতাস, মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিল তোমার পায়ের কাছে, আলতো চুম্বন করেছিল তোমার পায়ের পাতায় ! তুমি কি সামান্য কেঁপে উঠেছিলে অগোচরে ! ঘন হয়ে এসেছিল তোমার চোখের পল্লব !

সেসব কিছুই দেখেনি সেই ঘাতক। সে এক প্রবল নুলিয়ার প্রায় তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ঢেউয়ের আড়ালে। দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিল তোমার শাঁখা ও সিঁদুর। আর তখনই ঢেউ এসে ঢেকে দিল তোমাদের !

পরে, ঢেউ সরে গেলে, পড়ে ছিল শূন্য বালিয়াড়ি, ভাঙা-শাঁখা, দু-একটি মৃত-ঝিনুক, আর তোমার সামান্য কয়েকটি টুকরো !

তোমার সারা গায়ে তখন গভীর প্রবালের ক্ষত, ছায়া পড়ে আসছে তোমার স্খলিত বুকের উপর, খোলা চুল দাউদাউ উড়ছে ডাইনির মতো। আর, তারই পাশে পড়ে আছে অচেতন ঘাতক ও তার ম্রিয়মাণ অস্ত্রের স্মৃতি, আমি !

আর, বাইরে, একটু-একটু করে রাত ফুটে উঠছে, জলদেবতার মতো !

গুহাচিত্র

পালকের গা থেকে তখনও ঝরেনি সবটুকু জল। সাদা, আদিগন্ত সাদা পালকের সেইসব নিহিত জলবিন্দু এখনও যার সবুজ অতলে লেগে থাকে অপলক নক্ষত্রের মতো, আমি তার কেউ নই—জলের কিনারে ঝুঁকে-থাকা নিঃশব্দ ছায়ার মতো থাকি সামান্যই, আমি তার কেউ নই, কেহ নই। আমাদের অসুখে-বিসুখে স্বপ্নের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ঝরে পড়ে অকুল জলের বিন্দু, জল থেকে আরও জলে, জলের গভীরে। আর এইভাবে ক্রমশই আলাদা, বিচ্ছিন্ন, ছিন্ন ও ভিন্ন হতে থাকে আমাদের মধ্যবর্তী ছায়া, জল আর সেতুবন্ধনের অলীক কাহিনী....

আর, শেষ রাতে, সেই বুধবারে, অন্ধকারের লিপিকুশলতায় যখন শিথিল হতে থাকে জলের অন্তিম গ্রন্থিগুলি, গ্রন্থিমোচনের বেদনায় জ্বলে ওঠে একা-ডিঙিনৌকো, তার ক্ষীণ মাস্তুল, স্পর্শ থেকে স্পর্শহীনতার দিকে চলে যেতে থাকে ক্রমে ; লিপিহীনতার গূঢ় মানচিত্রে অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মতো ঝরে পড়ে জলমোচনের অভিমান ও অপমান সমানুপাতিক—তখন, ঠিক তখনই রঙিন মাছেদের যাবতীয় ঘনঘোর কাহিনী জেনে যাওয়ার আগেই জল জল আর জলের অবিবাহে ঢেকে যায় দিকচক্রবাল....

আর, আমি, মানে সেই ডিঙিনৌকো, স্বপ্ন থেকে এক রক্তাক্ত ঘুমের দিকে সরে যেতে-যেতে দেখি, জল তার লেলিহান জিভে শুষে খায় অবশেষ বালিয়াড়ির গোপন গুহাচিত্র, সবটাই....

একটি ধর্ষণের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন

সাদা থানের মতো একটি দীর্ঘ বাতাস যখন অবলুপ্ত নদীর উপর দিয়ে তরঙ্গহীন বয়ে যায়, যখন অস্পষ্ট বিকেলে পরিত্যক্ত করাতকলের উপর পড়ে থাকে বিষণ্ণ বটফলগুলি, তখন সেই গাঢ় নির্জনতার মধ্যে রাজনগরের মোড়ে বাস থেকে নেমে আমাদের আর কী-ই বা করার থাকে!

আর, কিছু করার থাকে না বলেই আমরা নিথর অপেক্ষা করি, ওই বালির স্রোত ভেঙে কখন ভেসে উঠবে সেই ডুবে-যাওয়া নৌকো ও তার মৃত যাত্রীরা, কিংবা কখন এক-টুকরো নীরক্ত মেঘ প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুঁকে পড়বে আমাদের মাথার উপরে, আর আমরা সেই গভীর বর্ণহীনতার মধ্যে তৈরি করে নেব আমাদের অলীক ঘর-বাড়ি।

অববাহিকার কথা সামান্যই জানা ছিল আমাদের। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলে অন্ধকার ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে জেনেছিলাম, অলৌকিকতা ছাড়া আর-কিছুই আমাদের সেভাবে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও, অলৌকিকতা বলতে আমরা ঠিক কী বুঝেছিলাম, তা-ও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা, এই বালির নদীতে কীভাবে ডুবে গিয়েছিল সেই যাত্রীবাহী নৌকো, এবং তার কোনও যাত্রীই আর ফিরে আসেনি, সুদূর বালিয়াড়িতে কেবল পড়ে ছিল শঙ্খচিহ্নের মতো একটি স্তব্ধ বক্ষবাস, কুয়াশা-ঘেরা শাড়ি ও শায়ার জটিল ভগ্নাবশেষ, এবং একটি মৃদু রুমাল—সেই তাৎপর্য আজও টের পাইনি আমরা! ফলে, সম্পূর্ণ বিষয়টি ওই আবহাওয়ার সংকেত আর সীমাহীন অলৌকিকতা দিয়েই বুঝতে হয়েছিল আমাদের।

আমরা বুঝেছিলাম, শেষরাতে একাকী চাঁদ যখন নেমে এসেছিল নদীর সীমান্তে, তখনই মোহনার দিকে অকস্মাৎ ভেসে উঠেছিল বেহুলার ক্ষীণ শরীর—তার সব সমারোহ তখন সিক্ত, বালি-মাখা! আর, সেই ভয়াবহ জলবায়ুর টানে ছুটে এসেছিল সন্ত্রস্ত ছায়াপুরুষেরা। প্রথমে তারা থমকেই দাঁড়িয়েছিল সামান্য। তারপর মুখে করে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঝাউবনের আড়ালে। তৃষ্ণার্ত, হতবাক চাঁদ দেখেছিল কীভাবে তারা তাকে স্বচ্ছ জলের মতো নগ্ন করে, সুতীব্র নখে একে-একে খুবলে নেয় তার সুগোল স্তন, অস্ফুট ঠোঁট এবং যোনিদেশের অবশিষ্টাংশ।

আর সে, ওই বেহুলা, চোখ মেলে দেখেছিল, কীভাবে সেই জলমগ্ন নদী একটু-একটু করে ভরে উঠল সাদা ও গভীরতর বালিতে! সে অপলক দেখেছিল দৃশ্যের প্রতিটি স্তর, পরম্পরা, পুঙ্খানুপুঙ্খ। যেন, তারপর, অবশেষে, সেইসব অন্ধকার টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তাকে

যেতে হবে ইন্দ্রের সভায়। যদিও পূর্ণতার আগেই সে আবার জ্ঞান হারায়।

রাজনগরের মোড়ে পড়ন্ত বিকেলে বাস থেকে নেমে শূন্য ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে, তিনহাজার বছর পর, আমরা অবিকল দেখলাম, সেইসব নিরবচ্ছিন্ন অলৌকিকতা কেমন জীবাশ্ম হয়ে আছে! আর, তার উপর বৃষ্টিবিন্দুর মতো অবিরল ঝরে পড়ছে রক্তাক্ত বটফলগুলি!

প্রতিহিংসা

রবিবারের বিকেলে তোমার উজ্জ্বল পোশাকের গায়ে হঠাৎই কেমন মেঘ জমে ওঠে! সিঁড়ি দিয়ে লঘু পায়রার মতো নিচে নেমে এসে, দিনের শেষে, তুমি যখন এই প্রাকারের সামনে দিয়ে মৃদু বাতাসের মতো হেঁটে চলে যাও, তখনই তোমার মভ রঙের আঁচল থেকে ছড়িয়ে পড়ে এক-টুকরো পীতকায় মেঘ; এমনকী, তোমার কাঁধ কামড়ে বসে থাকে যে-ঝলসানো সাদা স্ট্র্যাপ, তা-ও হঠাৎ কেমন ম্রিয়মাণ মনে হয়।

হয়তো এ-সবই মনের ভ্রম, চোখের ভুল। কিন্তু তোমার চশমার কাঁচের ভিতর যে কিছু কুয়াশা ছিল, ঠোঁটের উপর বিন্দু-তিলটি যে কেঁপে উঠেছিল একবার, তা তো তুমি নিজেও টের পেয়েছিলে অবিকল! আর, তোমার মভ রঙের শাড়ি উরুদ্বয় ও শ্রোণীর নিকটে যেরকম বশীভূত ছিল সেই অপলক বিকেলে, সেরকম আচ্ছন্নতার কথাও তো আগে কখনও ওঠেনি!

প্রাকারের সামনে আমি তখন ভিক্ষুকের মতো দৈনন্দিন উড়িয়ে দিচ্ছিলাম সাদাকাগজ আর বরাদ্দের কালো অক্ষরগুলি। যাওয়ার সময় ফিরেও দেখোনি তুমি। ফেরার পথে, আমি, কালো-হয়ে-যাওয়া মুখ তুলতেই, দেখি, তোমার জলবিন্দুর মতো মৃদু ঠোঁটে বিকেলের ধূসর মেঘ, চশমার ভিতর ঝাপসা হয়ে আছে করুণতর চোখদুটি!

শনিবারও তোমার বুকের উপর এলিয়ে পড়েছিল দীর্ঘ রৌদ্রমালা, সবুজে ছেয়ে ছিল তোমার অনঙ্গ, অনন্তের দিকে চলে যেতে-যেতে কুন্দফুলের মতো ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলে এককুচি ব্রীড়া ও লাস্য, আজ তা বহুদূর স্মৃতির সামগ্রী মনে হয়!

তারও আগে আমার ভিক্ষাপাত্রে সেই মলিন জ্যোৎস্নায় একদিন অকাতরে স্বর্ণমুদ্রার মতো ছড়িয়ে দিয়েছিলে বিখ্যাত উপহাসি। আর, সেই কলরোলে লাল-নীল মাছিগুলি উড়ে এসেছিল আমার দিকে, এসে বসেছিল আমার গায়ে-মাথায়। তুমি বোঝনি, টের পাওনি কিছুই। শুধু আরও গাঢ় হয়েছিল সেই ক্ষতমুখ!

আজ, রবিবারের আকস্মিক বিকেলে, তুমি কেন তবে ফিরে এলে গোধূলির মতো, তোমার মভ রঙের আঁচল থেকে ছড়িয়ে পড়ল পীতকায় মেঘ, চোখ ঢেকে গেল ঝাপসা কুয়াশায়, ঠোঁটের উপর লেগে রইল স্থির আবছায়া। পথপাশে বসে অনিদ্র ভিক্ষুকের মতো আমি কুড়িয়ে নিলাম সব দু-হাতে। আর, তোমার নিরলস দাম্পত্য থেকে খসে পড়ল একটি-দুটি শুকনো পাতা, কয়েকটি মৃত অক্ষর। আর, আমার সব না-লেখা পৃষ্ঠাগুলি ছুটে গেল তোমার পায়ের পাতার দিকে, তোমাকে প্রণামে ভিজিয়ে দেবে বলে!

অলীক

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি,
চাঁদ নিভে গেছে জলের উপর ;
তার ছায়াচ্ছন্নতা আমাকে ডাইনির মতো
দু-হাত বাড়িয়ে জড়াতে চায়
আকুল বন্ধনে....
আর আমাদের মধ্যে উড়ে আসে
শেষ মেঘ, হাওয়া, সবই অলীক !

গুহার ভিতর তখনও ছড়িয়ে আছে
চাপ-চাপ অন্ধকার, ভুল আগুন
আর পীতবর্ণ বিছানায় তীব্র মাংসের দাগ :
তিনহাজার বছর পর আমি
বাইরে বেরিয়ে দেখি, জলের ওপারে
দুলে ওঠে শূন্য নৌকা, তার মৃত নাবিক
জলের দিকে পাশ ফিরে শোয় !

আমার অত আগুন সবই বুক পেতে নিলে তুমি !
তোমার সাদা শাড়ি, তার মায়া
আমাকে জন্মান্তরের কথা বলে,
টেলিফোনে আমি
তোমার গায়ের গন্ধ টের পাই !

গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি,
চাঁদ নিভে গেছে জলের উপর ;
আর, তিনহাজার বছর পর, তুমি
এখনও ঝর্ণার মতো হেসে ওঠো, অবিকল !

এলিজি, পুনরপি

শূন্য থেকে শূন্যতর যে-নক্ষত্রের কথা তুমি ভেবেছ চিরকাল, সাদা ও অন্তিম সেই শূন্যতার ভিতরে চলে যেতে-যেতে অবশেষে তোমার মধ্যে বজ্রপাত হল। আমরা যারা শঙ্খের মতো তোমাকে বাজাতে চেয়েছিলাম আজীবন, তারা অপলক দেখলাম তোমার সেই অগ্নিময় অতলে তলিয়ে যাওয়ার শেষ দৃশ্য। বৃষ্টি তখন তোমাকে আরও সাদা ও নিবিড় করে তুলেছিল। তোমার শঙ্খযুগল ক্রমশ নীল হয়ে উঠল একটু-একটু করে, তারপর তা থেকে ছিটকে বেরুল কিছুটা সবুজ, মিশে গেল আগুনের আঁচে ও আভায়। আগুন থেকে তারপর নির্গত হল যে-গভীরতর রশ্মি, তোমার অবশিষ্ট চোখ চুল ঠোঁট ও কপোলকে তা করে তুলল আরও আর্ত ও মোহাচ্ছন্ন। আর তোমার আজানু নগ্নতা সেই নিবিড়কে ছুঁতে গেলে অন্ধ হয়ে গেল আমাদের সহস্র চোখ। তোমার নাভিমূল থেকে বেরিয়ে একটি শ্বেত সর্প খুব একা এগিয়ে গেল গিরিবর্ত্মের দিকে। আমরা দেখলাম।

এরকম এক নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতাই চেয়েছিলে আজীবন। আর আমরা সকলেই চেয়েছিলাম তোমাকে শঙ্খের মতো বাজাতে। শেষ পর্যন্ত এই দুই চাওয়ার ঠিক মাঝখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল ধোঁয়া। সাদা হয়ে গেলাম আমরাও। শেষবারের মতো।

শীৎকার

তারপর নাতিশীতোষ্ণ অন্ধকারে গুহা থেকে বেরিয়ে সেই কালনাগ বুকে হেঁটে পৌঁছল নিথর বেহুলার দিকে—প্রথমে সে জিভ দিয়ে স্পর্শ করল তার নীরব সিঁথি, তারপর কপোল, তারপর চোখ ও ঘুমন্ত মহিমাদুটি।

সে দেখল, বেহুলার কোনও ঠোঁট নেই, যেন চশমার মতো খুলে রেখেছে কোথাও—অত রাতে সে আর তা খুঁজে দেখতে চাইল না তত। বেহুলার সরলবর্গীয় বাহু ছুঁয়ে স্থির হতে চাইল ঘুমের প্রশান্তিতে শুধু।

বেহুলা ঘুমিয়ে ছিল হলুদ তৃণভূমির মত আঁচল ছড়িয়ে দিগন্তময়—স্বপ্নে জেনেছিল সে, যেন ফিরে আসছে কোনও দূরতর স্মৃতি; যেন অহল্যা জেগে উঠবে এখনই, ভেবেছিল মূর্খ সাপ, বেহুলা-শরীরে!

আদিগন্ত চরাচরে তখন ছড়িয়ে যাচ্ছিল এক গভীর হিমপ্রবাহ—অবিরল তুষারপাতের মধ্যে ঘুম থেকে স্বপ্নে, স্বপ্ন থেকে দূরতর স্মৃতির অতলে চলে যেতে-যেতে হঠাৎই ভেঙে গেল বেহুলার ঘুম। ঘুমহীনতার অন্তে যেন উড়ে এল বজ্র ও বিদ্যুৎ ঘনঘোর।

আর, মুহূর্তে, সাপ ও বেহুলার সেই ভুল শঙ্খ, হলুদ ও সবুজের সব কাতরতা ভেঙে খান-খান হয়ে ঢুকে গেল টেলিপ্রিন্টারের অনন্ত শীৎকারে!

ওষ্ঠচিহ্ন, দেখি

হেমন্তবাতাসের সেই শান্ত স্বরলিপি ডানা মেলে বারবার ছুঁতে চেয়েছে তোমার সেই দুটি অপলক উল্কাপিণ্ড। আর, সামান্য হলুদের বন্ধন ছিঁড়ে বনের পাখির মতো আমি তাদের আকাশের খোঁজে উড়িয়েই দিতে চেয়েছি চিরকাল। তোমার ও আমার মধ্যে যে-দুস্তর সীমন্তরেখা, কাঁটা-তার আর মরুঝড় বারবার সিঁদুরশাসনের ছলে ঢেলে দিতে চেয়েছে ছাইরঙের কুয়াশা ; মৃত্যুর মতো যে-সন্ত্রাস বুকে করে তুমি হাসিমুখে ঘুরে বেড়িয়েছ ইন্দ্রের সভায়—আমি তাকে ব্যঙ্গ করি আজ! তোমার ওই হলুদ এপিটাফ-দুটি পড়ে দেখার বাসনায় আমি যখনই ক্ষীণ বাতাসের মতো সেই স্থির জলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখনই মরীচিকার মতো খিলখিল করে হেসে উঠেছ তুমি! তোমার সেই নিঃশব্দ ঝঙ্কার রোদ্দুরে ছড়িয়ে যাওয়ার আগেই উল্লাসে ছুটে এসেছে কীট ও পতঙ্গেরা। আর, তোমার সেই হলুদ প্রচ্ছদের উপর তারা একটু-একটু করে ছড়িয়ে দিয়েছে লেলিহান কুয়াশা। আর, তখন, ঠিক তখনই, তোমার এককুচি নাভির উপর বৃষ্টিফোঁটার মতো কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে আমার শেষতম ওষ্ঠচিহ্ন, দেখি!

পলক

এইভাবে আমি ক্রমশই তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাই, দূরে চলে যেতে থাকি। মর্মাহত বাতাসেরা চেয়ে দ্যাখে, এক মলিন স্মৃতির ভিতর কীভাবে আমূল কেঁপে ওঠে সেই গূঢ় সন্ধ্যা, আমাদের সামান্য আয়োজন!

কীভাবে একদিন পদ্মফুলের উপর এসে বসেছিল চিত্রিত সাপ, বসে ছিল সারাটা দুপুর; কীভাবে গভীর কুয়াশা ব্রিজের উপর আচ্ছন্ন করেছিল আমাদের, কীভাবে জটিল ধোঁয়ায় ভরে উঠেছিল কফির খামার, কিংবা ট্যাঙ্কির আড়ালে মেঘ জমেছিল অসামান্য—বস্তুত, সে-সবই আজ স্মৃতির সামগ্রী!

মর্মাহত বাতাস আজ চুপ করে আমাদের চলে-যাওয়া দ্যাখে। রোদ বা বৃষ্টির সঙ্গে তার কিছু কথা হয়, জ্যোৎস্না ও সমাধিফলকও এ নিয়ে সামান্য কানাকানি করে। যেন, তারা সকলেই জেনে যায়, এক রবিবারের বিকেলে আমাদের সামনে জেগে ওঠে আদিগন্ত মাঠ—শূন্য ও নিরালম্ব। আর, মাঠ পেরিয়ে, স্মৃতি পেরিয়ে আমরা দুজন দুদিকে চলে যাই!

সেইসব ধূসর ও উজ্জ্বল দিনরাত আজও স্মৃতিধার্য থাকে। তারপর, একদিন, আমি অবশেষে অভিশাপের মতো সেইসব স্মৃতি কুড়িয়ে জড়ো করি। ইতিমধ্যে একটু-একটু করে শীত নামে পৃথিবীতে। সাপেরা ঘুমোতে যায়। আর, সেইসব ব্যর্থ অক্ষর, তার রূপক ও প্রতীক, কান্না ও বিদ্যুচ্চমক থেকে উঠে আসে আরও-কোনও গভীরতর মড়াকান্না!

সব জড়ো করে আমি তাতে আগুন দিই। নীল ও রক্তাভ আগুনের পাশে বসে আমি তার তাপ নিই, উত্তাপ ও উষ্ণতা!

শেষরাতে একটু-একটু করে নিভে আসে সেই দিগ্বিদিক আগুন। আর, তার উপর বৃষ্টিবিন্দুর মতো ভাসতে থাকে অচুম্বিত দুটি করুণ চোখ, পলক!

সিঁড়ি

বছরের শুরুতে হঠাৎই আততায়ীর মতো আমাদের দিকে এগিয়ে এল অসংখ্য, একের-পর-এক, অলৌকিক সিঁড়ি—একেবারে খাড়া ও নিরালম্ব সেইসব সিঁড়িগুলি সুদূর চলে গেছে নানাবিধ উত্থান ও পতনের দিকে!

ঝকঝকে, উজ্জ্বল সেইসব সিঁড়িদের সঙ্গে আমাদের আগে তত পরিচয় ছিল না। অথচ, সেইসব সিঁড়িদের সঙ্গে আমরা সকলেই, একটু-একটু করে, নিচে নামতে অভ্যস্ত হয়েছি; আর সেই গহন থেকে উপরে উঠে আসার সময় আমরা, স্বভাবতই, কেউ কারও মুখ দেখিনি, চোখ দেখিনি, হাত ধরিনি!

কেননা, আমাদের সকলেরই চোখে-মুখে একটি করে স্থির ও অপলক ঘড়ি তার কাঁটাদুটি দুলিয়ে গেছে অবিরাম; আর সেইসব নিরর্থক মুখের দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে, উজ্জ্বল ও সরলতর সিঁড়িরা যেভাবে এ ওর গায়ে পড়ে গভীর হাসাহাসি করেছে, তা-ও বিন্দুমাত্র টের পাইনি আমরা!

তোমাকে বিকল্প সিঁড়ির কথা বলেছিলাম যেদিন, সেদিন যেন খুবই আচ্ছন্নতা ফুটে উঠেছিল তোমার ঘড়ির কাঁটায়, চোখে ও ঠোঁটে ফুটিয়েছিলে সামান্য কুয়াশা! কিন্তু, পরদিনই, সকালে, স্নানের আগে, তুমি দ্বিধাহীন খুলে রেখেছিলে সেই নিষ্পলক কাঁটাদুটি তোমার পরিত্যক্ত পোশাকের পাশে!

আর, সেদিন দুপুরেই, আমার সীমাহীন প্রবণতা নিয়ে তুমি যখন সখিদের সঙ্গে সুতীব্র হাসাহাসি করেছ—তখন তোমার বেগুনি টিপ থেকে যেভাবে, হাসির গমকে, ঝরে পড়েছিল জ্যোৎস্নার রেণু—তা-ও চোখ এড়ায়নি আমার!

তারপর, বছরের শেষে, একদিন, শনিবার, সেইসব নিরাসক্ত সিঁড়ি অতিক্রম করে পাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে তুমি যখন প্রথম ও শেষবার হাতের পাতায় রোদ আড়াল করে সামান্য খুঁজলে আমায় সীমান্তের পরপারে—তখনই সমবেত সিঁড়িদের প্রবল অট্টহাসি শুনতে পেলাম আমি, অবিকল!

আর, দৈনন্দিন সিঁড়িগুলি হঠাৎই প্রাণ ফিরে পেয়ে জলস্রোতের মতো পাতালের দিকে নামতে থাকল, নামতেই থাকল, অবিরাম!

প্রতিদান

তারপর রাস্তা পেরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে সেই গভীর ময়ূর। অলংকৃত আঁচলের মতো তার পেখম, আচ্ছন্নতা। দূর থেকে আমি তার মেঘগুলি দেখি! অনন্তের দিক থেকে উড়ে আসে একটি-দুটি হলুদ পাতা, বৃষ্টির গুঁড়ো। পালকের আড়ালে আমি তার হৃদয়ের কথা ভাবি!

অরণ্য ছেড়ে সম্প্রতি শহরে এসেছে সেই সবুজ ময়ূর। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তিনহাজার-বছরের বিষাদ সে এইমাত্র মুছে নিল নিবিড় আঁচলে। এলো-মেলো জল তার পায়ের পাতার উপর দিয়ে চুম্বনের মতো বয়ে গেল পূর্ণতার দিকে। আমি তার ভেসে-যাওয়া ডানাগুলি দেখি, আততায়ী-চোখে!

অন্ধকারের গহ্বর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আমি সেই বিব্রত ময়ূরের জন্য সারা দুপুর ওত পেতে বসেছিলাম, যেন নিরবধিকাল, ময়ূরের ছায়া পাব বলে! আর, জিঘাংসাবশত সেই বিষণ্ণ ময়ূর প্রতিবার উড়ে গিয়েছিল দূরবর্তী হ্রদের দিকে!

আজ, রবিবারের সব মেঘ ছিঁড়ে ফিরে এল সেই চিত্রিত ডানা, অবিনশ্বর, ঝলমল। দেখে পুনরায় গা ছমছম করে ওঠে!

রাস্তা পেরিয়ে ময়ূরের মুখোমুখি হই, যেন শেষবার, যেন ওই একাকী ময়ূর উড়ে যাবে আবারও সেই ঘনঘোর বিস্মৃতির দিকে!

ময়ূরের পাশে বসে আমি হ্রদের কথা ভাবি। হ্রদ ও হৃদয়দুটি পাশা-পাশি বসে থাকে বিকেল ও সন্ধ্যার মতো, চুপচাপ, পরিপার্শ্বহীন। হাওয়া উড়ে যায়!

তারপর, অনন্তের আগে, হঠাৎই, পেখম মেলে আমার উপর গভীর আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই তীব্র ময়ূর, নিজেকে অপচয় করে, হ্রদের কিনারা থেকে উড়ে এসে ডানায় আচ্ছন্ন করে আমার সর্বস্ব, আলজিভ!

প্রতিহিংসাবশবর্তী ঠোঁটদুটি দিয়ে মুহূর্তে উপড়ে নেয় শিকারির দুই চোখ, আমার!

বৃষ্টি

আজ সারাদিনই অঝোর বৃষ্টি হয়েছে
দুপুরে একবার টেলিফোনে কিছু কথা হল
তোমার সঙ্গে—অধিকাংশই ঘর-সংসারের,
বাঁচা ও বেঁচে থাকার সাংকেতিক কথোপকথন ;
আমরা বৃষ্টির কথা বলিনি একবারও
বলিনি দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা
অথচ আজ সারাদিনই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছে !

না, কিছুটা ভুল হল, বৃষ্টির কথাও উঠেছিল :
আসলে, খুবই লাজুকভাবে বৃষ্টির কথা
জিজ্ঞেস করেছিলে তুমিই একবার ;
আর আমি তাতে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিলাম
কেননা, বৃষ্টির সঙ্গে এখন আমাদের
ঘোর অসহিষ্ণুতারই সম্পর্ক ;
ফলে কথা বাড়াওনি তুমি !

এইভাবে এবারও একদিন বর্ষা চলে যাবে
আমরা জল ভেঙে কোথাও বেড়াতে যাব না !

আগামীবারও আমি বর্ষাবন্দনা লিখব পুজোসংখ্যায় !

কোপাই

তোমাকে যেদিন প্রথম কোপাই বলে ডাকি
সেদিন আমার চারপাশে কোনও নদী ছিল না
তোমাকে কোপাই না-ডেকে যমুনা বা বিপাশা
বললেও খুব-কিছু এসে-যেত না
অথবা তোমার সঙ্গে চুর্নি নদীরও বেশ অমিল
ফলে আমি অনায়াসে বানিয়ে-বানিয়ে
চুর্নির সাদৃশ্যময় চিত্রকল্প রচনা করতেই পারতাম ;
কিন্তু ঘটনার তিনমাস পরেও আমি ভেবে পাই না,
সেদিন সন্ধেবেলা স্তব্ধ কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে
আমি হঠাৎ কেন তোমাকে কোপাই ভেবেছিলাম !

আর, কী অদ্ভুত, দ্যাখো, তারপর থেকে এই তিনমাসে
তুমিও কীরকম, কোনও পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই,
একটু-একটু করে এক পিপাসার্ত নদীই হয়ে উঠছ
যার কিছুটা কোপাইয়ের সঙ্গে মেলে
অনেকটাই মেলে না, মেলার কথাও নয় ;
যেমন দিকচক্রবাল বা মোহনা অথবা
তোমার নিস্তব্ধতাগুলি :
তোমার রহস্যময় নিষ্ঠুরতার সঙ্গেও নদীর
কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে....
কিন্তু তিনমাস আগে কলেজ স্ট্রিটে আমি
এসব কিছুই স্পষ্ট করে ভাবিনি,
ভাবার অবকাশও ছিল না !

অথচ, দ্যাখো, ঋতু শেষ হতে-না-হতেই
কেমন বালি জমে উঠল তোমার বুকে
বালি বালি আর বালিতে ঢেকে গেল তোমার অনন্ত :
এই অন্ত্যমিলের কথাই কি তা হলে
খুব অগোচরে আমি সেদিন ভেবেছিলাম, কলেজ স্ট্রিটে !

জন্মান্তর

আদিগন্ত মরুঝড় পেরিয়ে সীমারেখায় পৌঁছে
যখন শেষপর্যন্ত চোখ বুজে আসে
একটি হলুদ পর্দা দুলতে থাকে চোখের সামনে
শুকনো পাতাগুলি খুবই এলোমেলো
ছড়াতে থাকে নিজেরই গভীরে
আর আমি একটির-পর-একটি স্মৃতি
পেরুতে থাকি শেষ নাবিকের মতো
তখনই সিঁড়ির বাঁকে অবিকল তুমি
যেন গতজন্মের মতোই অমনস্ক মন্থর ও
অপেক্ষাহীন নিচে নেমে যাও
এক অনুপুঙ্খ রিক্ততার মধ্যে, দেখি !

একটি-একটি করে সিঁড়ি পেরিয়ে
তুমি এক অন্যতর শূন্যতার দিকে
চলে যাও, চলে যেতে থাকো
আর মার্চের দুপুর উড়ে যায় চারদিকে

সেই আবছায়ার দিকে চেয়ে
আমি নতুন করে জন্মান্তরের কথা ভাবি !

মধ্যবর্তী শূন্যতা

তারপর সেই গভীর শূন্যতার মধ্যে
ঢুকে পড়ে একটি সুতীব্র দুপুর,
জলপিপাসার মতো গভীরতর হাহাকার ;
আর এপ্রিলের ঝরা-পাতা ছাড়া
আর-কিছু স্থায়ী নয় জেনে
ট্যাক্সির ভিতর তুমি আরও রোদ ঘেঁষে বসো ;
তোমার স্তনবৃন্তে ক্রমশই জমে ওঠে
হেমবর্ণ মেঘ, বিন্দু-বিন্দু ঘাম :
আর এ-ভাবেই গাঢ় হয়ে ওঠে
আমাদের মধ্যবর্তী শূন্যতা, অলীক !

তারও পরে, একদিন, তোমার চশমাখোলা মুখ
আমাকে হাত ধরে নিয়ে যায়
সেই আশ্চর্য দিকভ্রান্তির দিকে :
কোপাইয়ের দিক দিয়ে
উড়ে আসে বেভুল হাওয়া,
আধখাওয়া চাঁদ নেমে আসে
সরোবরে জল খেতে,
ছায়াচ্ছন্ন শালবন হেসে ওঠে
হো-হো হাসি, ডাইনির মতো, পুনর্বার !

আর আমি তোমার চুম্বনযোগ্য
চোখ পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে
জল জল আর আদিগন্ত জল পেরিয়ে
মৃত্যুর দিকে চলে যেতে-যেতে দেখি,
তোমার ছিমছাম গার্হস্থ্য, স্থবির টেরাকোটা
আর অক্ষয় সিঁথির উপর ঘনঘোর
বৃষ্টি নামে, বছরে প্রথম !

অক্ষর

এইভাবে তুমি ক্রমশই একটু-একটু করে
অক্ষরের অতলে চলে যাও, অক্ষর আর অক্ষর
তোমাকে বিব্রত করে অহরহ, ঢেকে যায় তোমার সর্বস্ব
অক্ষরের ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও, অক্ষর অসুখ জানে না!

মহামারীর মতো সেইসব ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ অক্ষরেরা
তোমার ধ্যান ভঙ্গ করে, লণ্ডভণ্ড করে উদ্ভিদ ও গার্হস্থ্য
তোমার চোখের পাতায়, মণিতে, ঠোঁট ও চিবুকে
সেইসব নিষ্ঠুর ও উদাসীন অক্ষরেরা হাঁটে, ওড়ে!

তোমার চুল ও স্তন, নাভি ও যোনির কাছে
বিষের মতো পুঞ্জীভূত হয় সেইসব নিরাবেগ অক্ষর
দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও বিস্ময়চিহ্ন, পূর্বাপর
তোমার পিপাসাও ইতস্তত পান করে তারা!

তোমার হৃদয়ে যায় না কখনও সেই অক্ষরেরা
আবশ্যক দূরত্বে থাকে, অবৈধে, তুমি অকপট নিদ্রা যাও
সেই অবকাশে তারা একটু-একটু করে খেয়ে ফেলে তোমাকে
নির্জন উপকূলে অক্ষত পড়ে থাকে তোমার হৃদয়, একা!

অবিনশ্বর

যে-হাসিটি ঠিক হাসির মতো নয়, সামান্য মেঘময়
তিনদিন পরে আমি তাকে চিহ্নিত করি :
অক্ষরের গায়ে লেগে থাকে সেই মায়া, সামান্য শরীরী
আমি আজও তাকে চিরশূন্যতা মানি !

শুকনো পাতাগুলি তখনও একটি-দুটি ঝরে তার চুলে
আঁচলের ফাঁকে চাঁদ উঁকি দ্যায় আধখানা, সাদা ;
দুপুরের অভিলাষ কিছু ভেঙে যায় রোদের সন্দেহে
সামান্যই পড়ে থাকে ঝর্ণার বিস্তারে, ফুটপাতে !

তারপরও কিছু থাকে, ভুল ও ভালবাসাগুলি অনিমেষ
চেয়ে দ্যাখে সেই সুদূর মেঘ ও তার ছায়া ;
পাহাড়ের পরপার থেকে ফিরে আসে উদাসীন হওয়া
তোমার সমস্ত নীল ফিরে যায় অন্তিম গভীরে, একা !

যে-হাসিটি ঠিক হাসির মতো নয়, সামান্য মেঘময়
তিনদিন পরে আমি তাকে চিহ্নিত করি :
অক্ষরের গায়ে লেগে থাকে সেই ছায়া, সামান্য শরীরী
আমি আজও তাকে অবিনশ্বর মানি !

অতীতকাল

এইভাবে সমগ্র অতীতকাল অবিরল বৃক্ষের মতো
তোমার সামনে এসে দাঁড়ায় :
তুমি তাদের শনাক্ত করো—যেন পরিচিত শব,
প্রকৃত স্মৃতির মতো ধূসর ও অতীতময় ;
একটু-একটু করে তুমি তাদের চিনে নিতে থাকো !

তারপর যেদিন অবশেষে তোমার জানলায় বৃষ্টি নামে
ঘোর অবেলায় তুমি শূন্যচোখে সেইসব বৃক্ষদের
ঢেকে যেতে দ্যাখো বৃষ্টির ধূসরে
তখন তোমার সুদীর্ঘ অতীত তোমাকেও
টেনে নিতে থাকে চাদরের আশ্চর্য মায়ায় !

বৃক্ষেরা তোমাকে দ্যাখে, অপলক, বেলা যায় :
তোমাকে পুনরায় ভুলবোঝার জন্য উন্মুখ হয় কেউ
তোমাকে ভালবাসার কথাও বলে তারা
তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে চিরতরে
সাদা কাগজের প্রবঞ্চনা তোমাকে বাজায় !

আর, তখনই, একটি সবুজ নক্ষত্র মৃত জোনাকির মতো
ঝরে পড়ে তোমার চুলের উপর, রাসবিহারীর মোড়ে !

চাঁদ ও স্বৈরিণী

যেন অখণ্ড কাচের উপর দিয়ে তুমি
হেঁটে যাও জাদুবালিকার মতো
আর মধ্যরাত তোমাকে হাতছানি দ্যায়
ভুল বাতাসের দিকে
পলকে উড়ে যাও তুমি স্মৃতিহীন
ছেঁড়াকাগজের মতো
বাতাসে ভেসে যায় তোমার অনুকম্পাগুলি
স্তব্ধরাত তোমাকে কোলে তুলে নেয়
আশ্লেষে চুম্বন করে পথপাশে, সরাইখানায়
থুতু ও লালায় ভিজে যায়
তোমার অধরোষ্ঠ, প্রতিশ্রুতি !

রাত বাড়ে, জ্যোৎস্নায় প্রকাশিত হয়
তোমার দুটি নীরব জানলা
সেই অবকাশে মধ্যরাত নির্নিমেষে
আরও-কিছু ঝুঁকে আসে তোমার উপর
অবর্ণনীয় দুঃখের কথা বলে
তুমি তাকে স্নেহ দাও, মায়া দাও
দয়াপরবশ শরীর জেবলে দাও তাকে
আর আঁচল সরিয়ে সে তোমাকে অপচয় করে
হাওয়া ঘুরে যায় !

ব্রিজের শিয়রে খিন্ন চাঁদ তখনও রাত জাগে
অপলক চেয়ে দ্যাখে তোমার মহিমা
তারপর চুল ও আঁচল গুছিয়ে
তুমি যখন তীরে উঠে আসো
ছিন্নভিন্ন সে তখন তোমাকেই
কামনা করে, মেঘের আড়ালে যায় !

মর্মরধ্বনি

রাত-তিনটের সেই ঘুম-ঘুম চোখদুটি আমি এতদিন জমিয়ে রেখেছিলাম, জানতাম না নিজেই, ঘুণাক্ষরেও। সেই দুটি গোপন চোখ কি আমাকে পাহারা দিয়ে গেছে এতকাল! আমার সমস্ত প্রতীক্ষা কি গুপ্ত ঘাতকের মতো বারবার ছুটে গেছে তার দিকে! এইসব টের পেতে-না-পেতেই বুধবারের আচম্বিত বিকেলে তার শাড়ির অলঙ্কৃত পাড়ের উপর কেন মূর্ছা যাই আমি! সামান্য শাড়ির পাড় আমাকে নিয়ে যায় সেই বন্ধ তাঁতঘরের দরজায়। ইতিমধ্যে ধস নামে কফির খামারে।

সেভাবে কিছুই তো করার ছিল না আমার কখনও। তার স্নিগ্ধ চলা-চলের দিকে বিষণ্ণ ভিক্ষুর মতো খর-চোখ চেয়ে বসে ছিলাম আমি গোটা গ্রীষ্মের কাল। আততায়ীর মতো আমি তার ঘামের গন্ধ পেয়েছি, রক্তেরও। তার ঠোঁট থেকে কখনও খসে পড়েছে মেঘময়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হাসি। তার পায়ের পাতার কাছে জল কেঁপেছে সারা বর্ষায় নূপুরের মতো। তারপর দেখতে-দেখতে শরৎও চলে গেল।

তখন আমার আর কিছুই করার থাকে না। আমি তখন এক চির-দূরত্বের কথা বলি। জাগতে-জাগতে, লিখতে-লিখতে রাত শেষ হয়ে যায়। আঙুল গলে যায় মোমবাতির মতো। বাতাসে উড়ে বেড়ায় দুঃখী অক্ষরেরা। নৌকাগুলি হাসতে-হাসতে চলে যায় আরও মোহনার দিকে। আমি সেই নিষ্পলক চোখের ভাষা ভুলি। এইভাবে হেমন্ত চলে গেলে আসে বসন্তও। তার হলুদ হলুদ আর হলুদ শাড়ি ময়ূরের মতো ডানা মেলে, দেখি। শূন্যতার কোনও ভাষা থাকে না, বুঝি।

এইভাবে একটি নদী কখন যে নিজেই সামান্য পিপাসিত হয়ে পড়ে, তা কেউই টের পাইনি আমরা। আমি তখন তাকে নদী বলে চিনি, স্রোতস্বিনী। নদীর নির্জনতা, তার বিস্মৃতি আর নিষ্ঠুরতায় সে ক্রমশ জড়িয়ে যায় অম্লান রোদ ও জ্যোৎস্নার সঙ্গে। স্বর্ণমুদ্রার মতো স্মৃতি বাড়ে।

নদীর সঙ্গে খুবই অনিয়মিত সম্পর্ক তৈরী হয় একদিন। অক্ষর আর তার সমূহ স্তব্ধতা আমাকে সেই নির্জনতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে। টের পাই, ক্রমশ সে যেন নির্মিত হয় আমার ভিতর, নিখুঁত প্রতিমার মতো। আর, প্রতিবারই আমি সেই প্রতিমার অলীক আঙুল ছুঁতে গেলে কুয়াশার আড়ালে যায় সে। তার খিলখিল হাসি ঝর্ণার মতো ভেঙে পড়ে আমার সমূহ পাপ আর অন্ধকারের উপর। জন্মান্তর থেকে উড়ে আসে হাওয়া। বালিয়াড়ি কেঁপে ওঠে ঘোর অবেলায়। ঝাউবন থেকে বিলাপের ধ্বনিগুলি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে। আমি তখন

সেই বালির মর্মবেদনা অনুরূপ টের পাই। খুব ক্ষীণভাবে মৃত্যুর কথাও ভাবি আমি, একা, নিরবচ্ছিন্ন!

ক্রমশই তীব্র হয়ে ওঠে দুপুর। তোমার পর্দার উপর ঢেউ ভাঙে, দোলে। ঘরের সুনিবিড় ছায়া আর অসীম গার্হস্থ্য থেকে তুমি বাইরে এসে দাঁড়াও। রোদ, রোদ আর এপ্রিলের কর্কশ রোদে তখন পুড়ে যাচ্ছে আমার অতীত ও ভবিষ্যৎ। প্রতীক্ষার অহেতুক তাৎপর্য আমাকে নির্মমতার দিকে টানে। তৃতীয় দিন সবুজ দরজার দিকে তাকিয়ে বুঝি, একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেছে চিরতরে!

তিনহাজার-বছর আগে একদিন টেলিফোনে ডেকেছিলে, তুমি, মনে পড়ে। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে-যেতে মনে হয়, সেই পরাবাস্তব ডাক সঠিক বুঝিনি আমি। বুঝিনি, পাতাল না সমুদ্র—ঠিক কোনদিকে ইঙ্গিত ছিল তোমার!

কফিঘরের চারদিক দিয়ে তখন অট্টহাসির মতো রোদ আর বিপন্নতার মতো জলস্রোত আমাকে একটু-একটু করে ধরে। আর, তখন, ঠিক তখনই, তুমি এক গভীরতর মনখারাপের মধ্যে চলে যেতে-যেতে ফিরে যাও নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে। নিয়ম ও সীমা তোমাকে আচ্ছন্ন করে!

তোমার ভুলগুলি তুমি স্থির জানো বলেই আমি তারপর আর তোমাকে ভুল বুঝি না। তোমার অদ্ভুত চরিতার্থতা তোমাকে এইভাবে বারবার উড়িয়ে নিয়ে যায় স্থির বাতাসের দিকে। আমার ভিতরে ভূমিকম্প তৈরি হয় সেই অবিশ্বাস্য বাতাসের কথা ভেবে। আমি আজও ভেবে পাই না তোমার সেই রাত্রিকালীন অপেক্ষা আর হাসির মর্ম!

দিন যায়। মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে! স্মৃতি থেকে তুলোবীজের মতো উড়ে আসে গান। শুকনো পাতার মতো ওড়ে স্মৃতি। তিনদিন পর তোমাকে কেমন স্মৃতিধার্য মনে হয়!

রাত বাড়ে। তুমি আগের মতোই বেজে উঠবে টেলিফোনে, এই ভুল ভাবনা থেকে নিস্তার পেতে লিখি, লিখি, আর লিখি। গভীর রাতে আসে দেবদূতেরা, শয়তানের ছদ্মবেশে। ছাদে যাই। তোমার ঘুমন্ত, নির্জন শরীরের ঘ্রাণ, তোমার চুল ও চোখের অন্ধকার তখনও মৃত নক্ষত্রের গায়ে ফুটে আছে। নিচে জলের গায়ে পড়েছে তার ছায়া। তোমার গভীর নাভির কাছে শেষরাতে একটি করবী ঝরে পড়ে। তোমার আদিগন্ত নগ্নতার উপর ঝরে পড়ে গান ও পানের সেইসব মর্মরধ্বনি!

প্রথম দেবদূত আমাকে এগিয়ে দ্যায় তৃষ্ণার জল। দ্বিতীয়জন রুপোর পাত্রে সাজিয়ে দ্যায় হরিণের মাংস। তৃতীয় দেবদূত খুবই আন্তরিক হাতে ঢেলে দ্যায় গাঢ় রক্তবর্ণের ভিনদেশি মদ। আমি আঁজলা ভরে

পান করি সেই গূঢ় আগুন। দাউদাউ করে ধোঁয়া ওড়ে শরীর জুড়ে। চতুর্থজন এগিয়ে দ্যায় সুতীব্র বিষ। একটু-একটু করে নীল হতে থাকি আমি। তারপর, শেষরাতে, দেবদূতেরা ঝাঁপ দ্যায় অনন্তের দিকে!

মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে!

উঁচু ছাদ আর নিম্নবর্তী জল আমাকে এলোমেলো করে দ্যায় নিমেষে। ছাদ জুড়ে, যেন শূন্য বালিয়াড়িতে, তোমার অজস্র পায়ের ছাপ। আর তোমার নানারঙের পেখমগুলি বাতাসের মতো ওড়ে নীলিমার দিকে। জলে তার ছায়া পড়ে। জলে ছায়া পড়ে তোমার হাসি ও মনখারাপেরও। তোমার সেই ঘুম-ঘুম চোখ আর চুলের অন্ধকার আমাকে হাতছানি দ্যায় সেই অতল জলের দিকে। জলের উপর ঝরে পড়ে একটি-দুটি মৃত নক্ষত্র। দিগন্তের ওপারে তখন তোমার সুখী ও অনাবৃত শরীরে নামছে আদর ও ঘুম। ঘুমোও, ঘুমোও তুমি, প্রজাপতিরা তোমাকে পাহারা দেবে! মনে-মনে বলি। শেষরাতে মেঘগুলি শিউলি হয়ে ঝরবে তোমার গায়ে ও মাথায়! তোমার ঘুমন্ত নগ্নতার উপর বৃষ্টি নামবে বরফকুচির মতো! বাতাসেরা খুলে দেবে তোমার চুল। আহ্! ঘুম!

সারা শরীর একটু-একটু করে নীল হয়ে উঠছে আমার! মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে! গান বিষ হয়ে ঢুকে যাচ্ছে রক্তে, অন্তস্তলে! দেবদূতেরা, ওই, উড়ে গেল নীলিমার দিকে। এক, দুই, তিন, চার, এক! নক্ষত্রের শরীরে লুকিয়ে পড়ল তারা। আহ্ গান, আহ্ বিষ! আহ্, তুমি!

ভোরবেলা গার্হস্থ্যের জানালা খুলে তুমি দেখলে, মান্দাসের ভেলায় ভেসে যাচ্ছে একটি নীল শব, পচনশীল, আমার!

আর, তোমার ঠোঁটে, ওই, ফুটে উঠল সেই নিরবচ্ছিন্ন হাসি!

সরস্বতী

মেলামাঠের সেই তোবড়ানো চাঁদ যখন
একটু-একটু করে উগড়ে দিচ্ছিল তার
সমস্ত বিষ, মায়া, ফাঁদ ও নির্জন বিভাবরী
আর তার গমকে-গমকে দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল
আমার ভাঙাচোরা শরীর, ব্যর্থ আয়োজন :
তখন, ডাকবাংলোর বারান্দায়, সন্ধেবেলা, তোমরা
একে অন্যের আঙুলে সাবলীল বুনে দিচ্ছিলে
উষ্ণ ও রঙিন পশমের মতো
সেইসব গানের বেলা ও বালুকারাশি !

তারপর দেখতে-দেখতে কখন যে সন্ধে গড়িয়ে গেল
আর মেলার গভীরতা পেরিয়ে সেই নিঃশব্দ
ও আত্মঘাতী কুয়োটিও একসময় তোমাদের
গানের খাতার পাশে গিয়ে বসেছে
আর তার সমস্ত নির্জনতা স্বচ্ছ জলের মতো
বিছিয়ে গিয়েছে তোমাদের শান্ত সুজনির উপর
আর খুবই গোপনে সেই জল ও নির্জনতা
সবটাই ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে
তোমাদের স্থির স্বরলিপি ও গার্হস্থ্যের আশেপাশে ;
তা তোমরা বিন্দুমাত্র টেরও পাওনি !

আর, দূরে, বাইরে, টিলার উঁচুতে দাঁড়িয়ে
খুবই পূর্ণ চোখে সবটাই দেখলেন সেই বনদেবতা :
দেখতে-দেখতে হিংসা ও আবেশে চক্ষু বুজে এল তার ;
তারপরই নিমেষে ঝাঁপ দেন তিনি নিচের উপত্যকায়, বাতাসে-
ডানা ঝাপটে গিয়ে বসেন তোমার
উদ্ভাসিত হারমোনিয়মের উপর, মরালীর ছদ্মবেশে ;
আর, পলকে, তোমার গানের আঙুলগুলি
বরফে-বরফে ঢেকে যায়, নিরুপায়, শেষবার !

অসম্পর্ক

স্মৃতি তোমাকে এক আশ্চর্য কুহকের মতো
জড়িয়ে ধরেছিল সেই ধূসর সন্ধ্যায়
এক অচেনা রেলগেট পেরিয়ে হেমন্তের
আড়ালে চলে যাওয়ার আগে তুমি
ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলে কয়েকটি কোমল
আর আমি ফেরার পথে বারবার
একটি নীলরঙের স্তব্ধ জানলার কথা ভেবেছি
ভাবতে-ভাবতে কখন যে একটি অনিশ্চিত
সবুজ উপগ্রহের দিকে গড়িয়ে গিয়েছি
তা তুমি জানতেই পারোনি রাতভর !

পরদিন একটি মায়াবী দোলমঞ্চের মতো
তুমি যখন ফুটে উঠলে সাদা পৃষ্ঠায়
তোমার জানলা খুলে বেরিয়ে এল ভোরের পায়রারা
আমি তখন চাঁদের ওপাশে কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম
পাথর, নুড়ি, খড়কুটো ও দু-একটি জীবাশ্ম
বাংলোর বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে তুমি
হারিয়ে ফেলেছিলে সেইসব শব্দের মর্মঘাত
আর তোমার চারদিকে খুবই দ্রুত
ছড়িয়ে পড়ছিল অজস্র কাগজের কুচি, নির্জনতা :
সেদিকে তাকিয়ে খুবই গোপনে
কেঁপে উঠেছিল তোমার সিঁথি, দীর্ঘশ্বাস !

কবরখানা

নীহারিকাপুঞ্জ পেরিয়ে সেইসব নীল ট্যাবলেটগুচ্ছ
একটু-একটু করে এগিয়ে আসছিল আমার দিকে
আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেবে বলে!
এই সমাধিক্ষেত্রে এসেছি আজ দশদিন হল :
সাদা ও নম্র ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে প্রস্তরফলকের উপর
তাদের সামান্য রক্ত এবং দীর্ঘশ্বাস
এখনও লেপ্টে রয়েছে উদাসীন মর্মরের গায়ে
আর একটি নিঃসঙ্গ চাঁদের গর্ভ ফুঁড়ে
একটি-একটি করে ঝরে পড়ছে সেই নীল ট্যাবলেটগুচ্ছ
শীতের শুরুতে, এই ম্রিয়মাণ কবরখানায়!

দশদিনে সম্পূর্ণ হলুদ হয়ে গেছে আমার
বেমক্কা শরীর, মন ও নির্জন শিশ্নমুখ :
লেবুপাতারঙের বিকেলে বুড়োবুড়িরা বেড়াতে
আসে এই অন্তরীক্ষে, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারা
কথা বলে মৃত প্রতিবেশীদের সঙ্গে
আর সেইসব স্তব্ধ বিকেলগুলোয় আমি ক্রমশ
আরও হলুদ হয়ে যাই, হলুদে হলুদ ;
আমাদের ভুলগুলি সেই হলুদকে ঘিরে
নাচতে থাকে মাটির প্রজাপতির মতো
আর, সেই আদিগন্ত ধূসরের উপর
বৃষ্টির মতো ঝরে, ঝরতেই থাকে
নীল ট্যাবলেটগুচ্ছ, অবিরাম!

ডাকনাম

ঘুমের মধ্যে খুবই মৃদু দলে উঠল
সেই ভঙ্গুর সাঁকো, দীর্ঘ ও অবনত
জল খুবই সামান্য ছুঁয়ে ছিল তোমার কোমর
আর সেই বিস্মৃত অতীত একবার, একবারই
সবিশেষ ঢেকে দিল তোমার হেমন্তকাল :
দূর থেকে, ঘুমে, তোমাকে এভাবেই দেখলাম, শেষবার !

রাত্রি তখন তোমার স্বচ্ছ বুকে মুখ রেখেছে
তুমি জেনেছ সাঁকো মানে সেই স্থির অভিপ্রায় :
বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে তুমি যেভাবে চিরকাল
বুঝে নিতে চেয়েছিলে আমাদের সব বর্ণহীনতা ;
কঙ্কালিতলার হাহাকার ছাড়া তারপর তেমনই
আর-কিছু নেই, ছিল না কখনও !

তবুও তো শেষরাতে খুবই মৃদু দুলে উঠেছিল
সেই ভঙ্গুর সাঁকো, দীর্ঘ ও অবনত :
জলের ওপারে, অন্ধকারে, ভেসে ছিল তোমার
একটি-দুটি ডাকনাম, তালপাতার হার ও দুলও !

গ্রহান্তর

একটি হারিয়ে-যাওয়া লাল গ্রহ
হলুদ মেঘপুঞ্জ আর কঠিন জল পেরিয়ে
শেষবার যখন ভেসে উঠতে চাইল
সেই কোমল গার্হস্থ্যের দিকে
তখনই এককোটি-বছরের স্তূপীকৃত ছাই
খুবই এলোমেলো উড়তে-উড়তে
ঢেকে দিল তার দিকচক্রবাল
আর পলকে সেই মলিন গ্রহটি
টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল
ঘোর শূন্যতার চারদিকে
তার বাষ্প ও স্ফটিক থেকে ছিটকে
এল আগুন তোমাদের জানলায়
কেঁপে উঠল তোমার নীল পর্দা
বাহারি গাছ ও নিস্পন্দ ডোকরাগুলি
নিঃশব্দে ঝরে পড়ল লাভা
তোমাদের বিষণ্ণ রতিকালের উপর
ভাসতে থাকল টেরাকোটার চাঁদ !

অপেক্ষার দিনরাত

শীত এসে ঝুঁকে ছিল ব্রিজের শীর্ষে। অবেলায় তার আভা ও শুষ্কতা হঠাৎই ছুঁল তোমাকে। আর, তারপর, এক কোমল জলরঙের ছবির মতো তুমি একটু-একটু করে সিক্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলে কুয়াশার হিম আঙুলের ছোঁয়ায়। সেই শীর্ণ ও সাদা আঙুলগুলি সরীসৃপের মতো তোমার আঙুল থেকে শুষে নিতে চাইছিল মিথ্যে ও ভুল জ্যোৎস্না। তুমি তখন সেই আঙুলের নীরক্ত ও নিরচ্ছার ভাষা টের পাওনি বিন্দুমাত্র। কেবল বরফের উপর রোদ্দুর পড়ে একধরনের তাৎক্ষণিক ঝিলিক ফুটেছিল তোমার চোখে-মুখে। আর, খুবই দূর থেকে, সেই সুনির্মিত দৃশ্য দেখেছিল ব্রিজ ও প্রকৃত শীত। ঠিক তখনই খিলখিল করে বালিকার মতো হেসে উঠলে তুমি! কাঁচ ভাঙার শব্দে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকাল সেই পাঁচটি সরীসৃপ, সাদা। তুমি তা বিন্দুমাত্র টেরও পেলে না! আর, সেই অবকাশে, মুহূর্তে, সাদা আঙুলগুলি নীল হয়ে উঠল একটু-একটু করে! তার উপর ভেঙে পড়ল সেই হাসির লহরি, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি!

অপেক্ষার কথা বলেছিলে তুমিই একদিন। তারপর গুপ্তচরের মতো তিন-হাজার-বছর অপেক্ষা করেছে সেই শীর্ণ ও সাদা আঙুলেরা। কোটি-কোটি অক্ষরে ভরিয়ে তুলেছে সাদা, নিষ্কলঙ্ক পৃষ্ঠা। কোনওদিকে তাকায়নি আর। লাল নীল হলুদ সবুজ চিত্রকল্প, রূপক ও প্রতীকের আড়ালে ঢেকে রেখেছে যাবতীয় ক্ষুৎকাতরতা। ধু-ধু সাদা বালিতে মুখ ঢেকে অপেক্ষায় থেকেছে একটুকরো হলুদ জ্যোৎস্না দেখবে বলে। তুমি টেরও পাওনি সেইসব গূঢ় অভিলাষ! কেবল লবণাক্ত জল ও সাদা ঢেউ অবিরাম সব রক্ত শুষে নিয়েছে তাদের। সামুদ্রিক হাওয়া ও কল্লোল মর্মরধ্বনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের উপর, গায়ে-মাথায়। একটু-একটু করে আরও সাদা, আরও শীর্ণ হয়ে গেছে তারা!

অপেক্ষায় মিথ্যে ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, ছিল না সামান্যতম ভুলও। অপেক্ষাকে ধ্রুব বলে জেনেছিল সে। সময় তার পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকত পোষা কুকুরের মতো। এক গভীর গুহার মুখে দাঁড়িয়ে সময়কে অস্বীকার করতে শিখেছিল সে। একটি নিখুঁত শব্দের জন্য সে যেভাবে সময়কে হেলায় বয়ে যেতে দিয়েছে, ঠিক সেভাবে, এক অলোকসামান্য আবির্ভাবের জন্য, কথামতো, সময়কে তুচ্ছ করে কাটিয়ে দিয়েছে তিনহাজার-বছর। এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনও উপায়ই নেই তার। এক গভীরতর সময়হীনতার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে সে। তার আর-কোনও স্মৃতি নেই, সত্তা নেই। লুপ্ত সময়হীনতার উপর ঝরে পড়ে ঝড়, বৃষ্টি, রোদ, কুয়াশা ও সামান্য-কিছু নক্ষত্র ও উল্কাপিণ্ড!

হেমন্তের সন্ধ্যায় যখন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে চারপাশ, সেদিন, শূন্য খাঁ-খাঁ

মাঠের শেষে যখন গতজন্মের দিকে মুখ করে পড়ে আছে একটি ভাঙা নৌকো, নীলিমার দিক থেকে তখন সে খুবই আবছা দেখেছিল তোমাকে। তোমার হলুদ আঁচল উড়ছিল হিরণ্যের মতো। দেখে গা ছমছম করে ওঠে তার!

একটি সুপ্রাচীন দুর্গ থেকে বেরিয়ে, তুমি, অবশেষে, যেন সামান্য দ্বিধার মধ্যে, ঠোঁট চেপে অপেক্ষা করো তিন-পলক, কেউ কোথাও নেই, চরাচর নির্জনতর, দেখে নির্ভার হও। আর, তখনই তোমার সামনে বশীভূত প্রেমিকের মতো এসে দাঁড়ায় এক দৃপ্ত ও আত্মবিশ্বাসী নীল মোটরবাইক। তার ধাতব গর্জনে চমকে ওঠে নোঙরহীন মৃত নৌকাটি। চোখ মেলে চায়। সে দ্যাখে, খুব স্পষ্টই দ্যাখে, চালকহীন সেই অলৌকিক গতিযান নীল, ঘননীলে তোমাকে হাতছানি দ্যায়। আর, তুমি, তার বশ্যতায় বশীভূত, গর্ভিণী চাঁদের মতো আহ্লাদে হেসে ওঠো। লাল ফুলের মতো হেলমেটটি খুবই সাবলীল হাতে চুলের উপর বেঁধে নাও!

তারপর সেই বাতাসের পিঠে সর্বস্ব সমর্পণ করে সামান্য ঝুঁকে বসো অনির্দেশের দিকে। পিছনে পড়ে থাকে তোমার সমূহ অতীত, প্রতিশ্রুতি। তুমি নির্জন রাতের দিকে নিজেকে ঢেউয়ের মতো মেলে দিয়ে হাসো, হাসতেই থাকো। আর তুমি যত হাসো, সেই নীলযান ততই গর্জন করে, ঢেউ তুলে এগিয়ে যায় আরও নিরুদ্দেশের দিকে। তোমার গা থেকে খুলে-খুলে পড়ে জ্যোৎস্নার কুচি, জানকীর আভরণের মতো। অপেক্ষার কথা হয়েছিল তিনহাজার-বছর আগে, তা তখন আর মনেও পড়েনি তোমার! ঠিক তখনই মরুঝড়ে আচ্ছন্ন হয়েছিল সেইসব শীর্ণ ও সমাহিত আঙুল। কলম পিছলে গিয়েছিল, কালি শুকিয়ে গিয়েছিল তার। কেবল সেই অন্তিম নীলযান ছুটে গিয়েছিল স্মৃতি পেরিয়ে দূরতর ছলনার দিকে!

অপেক্ষা ছিল তারও পর, পূর্বাপর। কেননা, অপেক্ষার কথা বলেছিলে তাকে তুমি, তুমিই, অন্য-কেউ নয়। তোমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ শব্দ ও নৈঃশব্দ্যকে সে ওই তিনহাজার-বছর আগেই ধ্রুব বলে জেনেছিল। তোমার একটুকরো জ্যোৎস্না দিয়ে তার বাকি দিন কেটে যাবে, ভেবেছিল। সে কি ভুল ভেবেছিল! প্রবণতা খুব বেশি ছিল তার!

তারপর, যেদিন ঝরোখার আড়ালে সে প্রকৃতই ছুঁল তোমার নীরব আঙুল, আর, ছুঁতেই অবর্ণনীয় বিদ্যুচ্চমকের মতো উড়ে এল এলোমেলো উপমা ও চিত্রকল্প—মনে-মনে খুবই বিরক্ত হয়েছিল সে। কেননা, দূর থেকে সেই ব্রিজ আর শীত অনিমেষ চেয়ে দেখছিল তোমাদের। পাঁচটি আঙুল জড়িয়ে গিয়েছিল অন্যতর পাঁচটি আঙুলের ঘামে ও বিষাদে। তোমার ফরসা অনামিকায় অস্ফুট ভোরের মতো ফুটে উঠেছিল একটি মৃদু অঙ্গুরী,

মায়া! অন্ধ চোখে সবটাই দেখেছিল সে-ও। তার সাদা আঙুলের ডগায় তিনহাজার-বছরের হিম, বল্মীক, অপেক্ষা, নখ। সেদিকে তাকিয়ে সেই পাঁচটি আঙুলকে খুবই ঘৃণা হল তার। বরফের আঙুলগুলি যখন রোদ্দুরে ঝলসে উঠেছিল চকিতে, তখন, ঠিক তখনই, সে পুনরায় সেই তীব্র মোটরবাইকের গর্জন টের পেল। আর, তখনই, ঝনঝন করে হেসে উঠলে তুমি! সেই ঝঙ্কারে সে দূর থেকে ভাঙা নৌকাটি টের পেল। তিনহাজার-বছরের খিদে, তৃষ্ণা, ঘুম প্রতিশোধ-তৎপর হয়ে উঠল নিমেষে!

তারপর তার আর কিছু মনে নেই। অন্ধকারের আড়াল খুলে সে ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্রিজের নিচে, মোহনায়। শুধু, সেই গভীর জলের ভিতর শুয়ে সে বোঝে, তার প্রকৃত অপেক্ষার দিনরাত্রি শুরু হল, তারপর!